প্রাধান্য পাবে স্যাটেলাইট, উড়োজাহাজ ও অস্ত্র বিক্রি

দু’দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন। তার সম্মানে প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত ভোজসভায় যোগ দেবেন। দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর এবং একটি যৌথ প্রেসব্রিফিংয়ে অংশ নেবেন। ঢাকায় ফরাসি দূতাবাস তাদের ফেসবুক পাতায় বলেছে প্রেসিডেন্টের এই সফরে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে ভূমিকা রাখবে।

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বিষয়ক সমঝোতা চুক্তি
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ বাংলাদেশ সফরকালে মহাকাশে আরও একটি নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের চুক্তি সই হতে যাচ্ছে। ফ্রান্সের সহায়তায় এবার যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে তার নাম বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট—২। এটি একটি ‘আর্থ অবজারভেটরি’ ভূ—উপগ্রহ কেন্দ্র। এর মাধ্যমে পৃথিবী তথা বাংলাদেশের স্থলভাগ ও জলভাগ পর্যবেক্ষণ করা হবে। বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হয়েছিলো ২০১৮ সালের ১৯শে মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে। এটিও নির্মাণ করেছিলো ফরাসি একটি প্রযুক্তি কোম্পানি।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চিহ্নিত হওয়ায় সমুদ্র অঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমুদ্র অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো সম্ভব হবে এই দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় কেউ অনধিকার প্রবেশ কিংবা কোনো অপতৎপরতা চালাচ্ছে কি না সেটাও এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানা যাবে।

২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে বিরোধপূর্ণ ১ লক্ষ ১১ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং ২০১৫ সালে ভারতের কাছ থেকে ১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমা জয় করে বাংলাদেশ। কোনরকম যুদ্ধ ছাড়া, রক্তপাত ছাড়া শেখ হাসিনার দূরদর্শীতা এবং মস্তিষ্কপ্রসূত

সুচিন্তার ফলাফল ছিল এই বিশাল সমুদ্রসীমা বিজয়। এবার সমুদ্রে নিজেদের নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্রান্সের সাথে এই সমঝোতা চুক্তি সই করবে সরকার।

এয়ারবাস থেকে উড়োজাহাজ কেনা
চলতি বছরের শুরুতে ফ্রান্সের এয়ারবাস কোম্পানি থেকে ১০টি উড়োজাহাজ কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং থেকেও নতুন উড়োজাহাজ কেনা অব্যাহত রাখার বিষয়েও চাপ আছে। আমেরিকান ভিসা নীতি বা স্যাংশানের মাঝেই মূলত এবছরের শুরুতে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো বাংলাদেশ। এ বছরের ২২ মার্চ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ বহুজাতিক কোম্পানি এয়ারবাসের কাছ থেকে উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা করছে। তবে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় কতটি উড়োজাহাজ কেনা হবে, সে ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

এয়ারবাস পৃথিবীর অন্যতম বড় বিমান সংস্থা, যারা বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের নকশা, নির্মাণ ও বিপণন করে। এটি ইউরোপভিত্তিক এবং ফ্রান্স, ব্রিটেন ও স্পেনে তাদের বড় অফিস ও সংযোজন কারখানা রয়েছে। এয়ারবাসের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং, যাদের কাছ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস কিছুদিন আগে বেশ কয়েকটি উড়োজাহাজ কিনেছে।

এয়ারবাস বাংলাদেশকে এভিয়েশন খাতে প্রযুক্তি বিনিময়ের পাশাপাশি শিক্ষা ও দক্ষতাবিষয়ক সহায়তাও দিতে চায়। এর মাধ্যমে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে এভিয়েশন খাত নিয়ে যোগাযোগ আরও গভীর হবে বলে তখন গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান।

সমরাস্ত্র বিক্রি
বাংলাদেশও ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’ এর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী আধুনিকায়নের কাজ শুরু করেছে। ২০২০ সালের মার্চে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঢাকায় এসেছিলেন বাংলাদেশের কাছে রাফাল জঙ্গি বিমান বিক্রির প্রস্তাব তুলে ধরার জন্য। এরপর ২০২১ সালে শেখ হাসিনার ফ্রান্স সফরের সময়ে একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেছিলো বাংলাদেশ ও ফ্রান্স। দেশটি অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশে সমরাস্ত্র বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। তাই এ বিষয়ে এবার কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে মনে করছেন

বিশ্লেষকরা।

সাম্প্রতিক সময়ে আফ্রিকার দেশগুলোতে ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী আধিপত্যের এক পতন পর্বের শুরু হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মহল ধারণা করছে। এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে ফ্রান্স। তাই ফ্রান্সের দরকার নতুন ব্যবসায়িক গন্তব্য। ফলে অনেকের ধারণা যে, জি—২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, এ অঞ্চলে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটানো। এব্যাপারে সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, “সমরাস্ত্র হোক আর এয়ারবাস হোক—তাদের মূল ফোকাসই থাকবে ব্যবসা। আর মনে রাখতে হবে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে ফ্রান্সের স্বতন্ত্র সামরিক উপস্থিতি আছে। অর্থাৎ এ অঞ্চলটি তাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই ফ্রান্স চাইবে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরও উন্নত করতে।‘

ফ্রান্স বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রধানতম খেলোয়াড়দের একটি, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। তাই চুক্তি যাই হোক, সর্বোচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের এই সফর দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনার নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করবে বলেই ধারণা করা যায়।

আবার বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আগ মুহূর্তের এই সফর কূটনীতিতে বাংলাদেশ সরকারকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কারণ ফ্রান্সের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বৈশ্বিক বিষয়গুলোর গতিপথকে প্রভাবিত করে। তাই আগামী নির্বাচনে ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্ব থেকে সরকারের প্রতি নানামুখী যে চাপ রয়েছে তা প্রশমিত করার ভালো একটি উপলক্ষ্য হতে পারে এই সফর।

ড. ইউনূসের পক্ষে দেয়া বিবৃতি

প্রত্যাহারের দাবি ২শ বাংলাদেশি আমেরিকানের

এবার ড. ইউনুসের পক্ষে যারা বিবৃতি দিয়েছিলেন তাদের সেটা প্রত্যাহারের দাবি জানালেন ২শ বাংলাদেশি আমেরিকান। এক বিবৃতিতে তারা এই দাবি জানান। শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে বিদেশি নাগরিকদের বিবৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৬ সেপ্টেম্বর নেতৃস্থানীয় ২০০ বাংলাদেশি আমেরিকান নাগরিক বিবৃতি দিয়েছেন। ইউনূসের পক্ষে বিবৃতি দেয়াকে ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ আখ্যায়িত করে তারা গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছেন।

প্রতিবাদলিপিতে এই বাংলাদেশি আমেরিকানরা বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই বিবৃতিটি কোনো সঠিক তথ্য না জেনেই দেওয়া হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দেওয়া চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ আর দুই লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে আক্রমণ করেছে। তারা বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে অর্থপাচার, কর ফাঁকি ও শ্রম অধিকারের অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। এইসব অভিযোগের মামলা এখনো বিচারাধীন এবং কোনো রায় এখনো হয়নি। তাই বিচারাধীন মামলা নিয়ে এমন বিবৃতি দেয়াকে প্রতিবাদলিপিতে স্বাক্ষর করা বিশিষ্টজনেরা দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তারা উল্লেখ করেন, ‘স্বাক্ষরকারীরা যাদের অনেকেই আইনের শাসন নিয়ে কথা বলেন- তারাই বাংলদেশে ড. ইউনূসের বিচারের অভিযোগগুলো নিয়ে কোনোকিছু না জেনেই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।‘

সবশেষে ড. ইউনূসের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নেতৃস্থানীয় বাংলাদেশি আমেরিকানরা বলেন, দলগতভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া এই বিবৃতি প্রত্যাহার করে ১৭০ মিলিয়ন বাংলাদেশির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিবৃতিতে সাক্ষরদানকারীরা হলেন ড. নুরন নবী (কাউন্সিলম্যান, নিউজার্সি), এবিএম নাসির (অধ্যাপক, নর্থ ক্যারোলিনা), আবু আহমেদ মুসা (কাউন্সিলম্যান, মিশিগান), রানা হাসান মাহমুদ (প্রকৌশলী, ক্যালিফোর্নিয়া), ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ (অধ্যাপক,

পেনসিলভেনিয়া), স্বীকৃতি বড়ুয়া (আইটি প্রকৌশলী, নিউইয়র্ক), আবুল খান (স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ, নিউ হ্যাম্পসায়ার), মাহবুবুল তয়ুব আলম (মেয়র, মিলবোর্ন, পেনসিলভেনিয়া), মো. নুরুল হাসান (কাউন্সিলম্যান, মিলবোর্ন, পেনসিলভেনিয়া), ড. সুফিয়ান এ খন্দকার (বিজ্ঞানী), ড. আশরাফ আহমেদ (বিজ্ঞানী ও লেখক), ড. জোতি প্রকাশ দত্ত (লেখক, ফ্লোরিডা), প্রফেসর আবু নাসের রাজিব (ক্যালিফোর্নিয়া) মোরশেদ আলম (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইয়র্ক), আহাদ আহমেদ (প্রকৌশলী, মিশিগান),ড. বামন দাস বসু (বিজ্ঞানী, মাসাচুসেটস), সাফেদা বসু (অ্যাক্টিভিস্ট, মাসাচুসেটস), ড. খন্দকার মনসুর (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক) ড. মহসিন পাটোয়ারি (অধ্যাপক, নিউইয়র্ক) জামাল উদ্দিন হোসেন (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, আলাবামা), ড. মহসিন আলী (লেখক, নিউইয়র্ক), দস্তগীর জাহাঙ্গীর (সাংবাদিক, ভার্জিনিয়া), ফাহিম রেজা নূর, (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইয়র্র্ক), ড. জিনাত নবী (বিজ্ঞানী, নিউজার্সি), হাসান ফেরদৌস (লেখক, নিউইয়র্ক), মেজর (অব.) মঞ্জুর আহমেদ (কমিউনিটি লিডার, নিউইয়র্ক), ড. প্রদীপ কর (বিজ্ঞানী, নিউইয়র্র্ক), ডা. প্রতাপ দাস (চিকিৎসক, নিউইয়র্র্ক),
কৌশিক আহমেদ (সম্পাদক, নিউইয়র্ক), লাভলু আনসার (সাংবাদিক, নিউইয়র্ক), রাফায়েত চৌধুরী (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইয়র্র্ক), আবু তাহের (অ্যাক্টিভিস্ট, পেনসিলভেনিয়া), সউদ চৌধুরী (অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইয়র্ক), ড. মিজান আর মিয়া, (অধ্যাপক, ইলিনয়)।

দুদিনের সফরে ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো

নির্বাচনী ডামাডোল শুরুর আগে আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো ঢাকায় আসছেন। তার ঢাকা আসাকে কেন্দ্র করে বেশকিছু নতুন আগ্রহের জায়গা উন্মোচিত হতে চলেছে।

গত তিন দশকের মধ্যে এই প্রথমবার বাংলাদেশ সফরে আসছেন ফ্রান্সের কোন প্রেসিডেন্ট। ভারতে অনুষ্ঠিতব্য দু’দিনের জি—২০ সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে ১০ সেপ্টেম্বর তিনি বাংলাদেশে আসবেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশে আসছেন ফ্রান্সের ইউরোপ ও ফরেন এফেয়ার্স মিনিস্টার ক্যাথেরিন কলোনা।

এরই মধ্যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে বিবৃতিও দেওয়া হয়। যেখানে বলা হয়েছে, “বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেটি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তার অংশীদারিত্বে বৈচিত্র্য আনতে চাইছে।“ এতে বলা হয়, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স দু’দেশই বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দারুণ একতা দেখায়। বিশেষ করে, প্যারিস এজেন্ডা ফর পিপলস অ্যান্ড দ্য প্ল্যানেট—এর পরিকাঠামোর মধ্যে এই ঐক্য প্রতিফলিত হয়।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর আসন্ন বাংলাদেশ সফরকালে মহাকাশে আরও একটি নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের চুক্তি সই হবে। ফ্রান্সের সহায়তায় এবার যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে তার নাম বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট—২। এটি একটি ‘আর্থ অবজারভেটরি’ ভূ—উপগ্রহ কেন্দ্র। এর মাধ্যমে পৃথিবী তথা বাংলাদেশের স্থলভাগ ও জলভাগ পর্যবেক্ষণ করা হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, ফ্রান্স কেন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আগ মুহূর্তের এই সফর কূটনীতিতে বাংলাদেশ সরকারকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কারণ ফ্রান্সের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বৈশ্বিক বিষয়গুলো গতিপথকে প্রভাবিত করে।

এদিকে ফ্রান্স বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রধানতম খেলোয়াড়দের একটি, যারা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এছাড়া বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের বড় অংশ যায় ফ্রান্সে। বাংলাদেশেল পোশাক রপ্তানির অন্যতম ভালো বাজার ফ্রান্স। যেখানে বার্ষিক রপ্তানি প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি। ২০২১—২২ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১.৩৮০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি করেছে ফ্রান্সে, বিপরীতে ফ্রান্স থেকে আমদানী হয়েছে প্রায় ১০৯ মিলিয়ন ডলারের পণ্য।

বাংলাদেশ এবং ফ্রান্স উভয়ই জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবিলায় সক্রিয়ভাবে জড়িত। ফ্রান্স নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জলবায়ু অভিযোজন—সম্পর্কিত প্রকল্পসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের কিছু প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আগামীতে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে ফ্রান্স। তাই ফ্রান্সের দরকার নতুন ব্যবসায়িক গন্তব্য। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, জি—২০ সম্মেলনে ফ্রান্সের যোগ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, এ অঞ্চলে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটানো। ফলে, ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে পশ্চিমাদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য আরো অনেক দেশের মতো ফ্রান্সও বাংলাদেশকে বাণিজ্যিক বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম থেকে শুরু করে সামরিক অস্ত্রের জন্য ফ্রান্স বাংলাদেশকে ক্রেতা হিসাবে পেতে চাইবে।

তিন দশক পরে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের এই সফর দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনার নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করবে। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের এক দাবির মাঝে যুক্ত হচ্ছে লেজ

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে গণমিছিল করেছে বিএনপি। সরকারের পদত্যাগসহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবি আদায়ের কথা বললেও বিএনপি প্রায়শ একটা দুটো দাবি লেজ আকারে জুড়ে দিচ্ছে। বিএনপির সব নেতার সাথে বসে সিদ্ধান্ত না নিয়ে হুট করে নতুন দাবি তোলা দলটির অভ্যন্তরীণ মন কাষাকষির কারণে হচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলোর একাধিক দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৯ জুলাই ঢাকার চার প্রবেশমুখে বিএনপির সমন্বয়হীন অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে বারবার

নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। ২৮ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে হুট করে ঘোষণা করে দেওয়া হয় এই কর্মসূচি। এই আন্দোলন নিয়ে আগাম কোনো আলাপ আলোচনা যুগপৎ এর মধ্যে হয়নি। এধরনের সমন্বয়হীনতার বিষয় বিএনপির নেতারা বারবারই করছেন। যুগপৎ এর নেতারা বলছেন, বিএনপি এরকম করছে এবং সামনের দিনে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া শরিক দলগুলোর কোনো কোনোটির কাছ থেকে ভবিষ্যতে আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তে কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ শরিকদের যুক্ত করা বা সময়মতো অবহিত করার পরামর্শ এসেছে।

সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে যায় বিএনপিসহ ৩৬ রাজনৈতিক দল। গত জুলাই মাসে এসব দলে যারা যুক্ত হয় তাদের অধিকাংশ বিএনপির সমমনা দল। যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য। এর পরেই এক দফা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সেসময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণমাধ্যমকে বলেন, ‘শিগগিরই আমরা এক দফা আন্দোলন শুরু করব। অর্থাৎ বিএনপির ১০ দফা ও যুগপৎ আন্দোলনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দফাগুলো মিলিয়ে এক দফা করা হয়েছে। অবৈধ সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন বাতিল করে নতুন কমিশনের অধীনে নির্বাচন। এখন এসব দাবি নিয়ে একটা জায়গায় আমরা এসেছি। সেটা মূলতই এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগের দাবি’।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, যদি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদফা দাবিতেই লাগে তাহলে বিএনপি একেক সময় একেকটি দাবি যুগপৎ এর কর্মসূচিতে কীভাবে যুক্ত করে? যুগপৎ আন্দোলনের শরিক বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, “আমরা এখন যারা যুগপৎ আন্দোলনে আছি তারা লিয়াজো কমিটির মাধ্যমে কাজ করছি। বিক্ষোভ, অবরোধ, ঘেরাও ও হরতালসহ সব কর্মসূচিই আমাদের বিবেচনায় আছে। আমাদের দাবি একটা। এর সাথে পৃথক দাবি যার যার দলের থাকতে পারে। যুগপৎ কর্মসূচির বাইরেও আমাদের নিজস্ব কর্মসূচি থাকবে।” যদিও বিএনপি নেতা রিজভী বারবারই যুগপৎ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে গিয়ে একাধিক দাবি ঘোষণা দিয়ে দেন।

আরেকটি বিষয়েও যুগপৎ এর সঙ্গে তথ্যগত লুকোচুরি করছে বিএনপি। যুগপৎকে না জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামায়াতে ইসলামীর এক সিনিয়র নেতা জানান, ‘আমরা সাথে আছি বলছি না। কেন্দ্র

থেকে তৃণমূল পর্যন্ত চূড়ান্ত আন্দোলনে নেতাকর্মীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। সবগুলো দল নামনে তখন আমরাও মাঠে থাকবো।

শেখ হাসিনার সঙ্গে সেলফি তুলেছেন জো বাইডেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সেলফি তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এসময় সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। শনিবার ভারতের দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে দুই রাষ্ট্রনেতা কিছুক্ষণ কথাও বলেন।

ড. ইউনূসের পক্ষে দেয়া বিবৃতি প্রত্যাহারের দাবি নোবিপ্রবির ২৫৬ শিক্ষকের

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রমআইনে বিচারাধীন মামলা স্থগিত চেয়ে ১৬০ ব্যক্তির বিবৃতি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার উপর অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপ বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নীলদলের ২৫৬ জন শিক্ষক।

নোবিপ্রবি নীলদলের সভাপতি ড. এমডি মাসুদ রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনসহ ২৫৬ জন সদস্যের সকলেই স্বাক্ষর করেন।

প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। যেখানে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে আইনের শাসন বিদ্যমান এবং আইন সবার জন্য সমান হওয়ায় এখানে দেশীয় বা বহিরাষ্ট্রীয় কারো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান মামলার বিষয়ে অযাচিত এবং অপ্রয়োজনীয় বিবৃতি বা চিঠি প্রদান করা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার উপর অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপ এবং ড. ইউনূসের ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিবৃতি অত্যন্ত অমানবিক বলে মনে করেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬ জন শিক্ষক।

পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়, উদ্বেগের সাথে লক্ষণীয় যে উক্ত বিবৃতিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, রাজনীতি ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিরূপ মন্তব্যও করা হয়েছে। যা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এই ধরনের অযাচিত, অবমাননাকর ও বেআইনি হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাকে নিন্দাভরে প্রত্যাখ্যান করে।

এ ছাড়াও আরো বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সুনাম ও সমৃদ্ধি যখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে তখন একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে উক্ত বিবৃতি দেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিমূলক।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নীলদল এই ১৬০ কর্তাব্যক্তির বিবৃতির প্রতিবাদ ও প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

উল্লেখ্য, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রমআইনে চলমান মামলা স্থগিত চেয়ে কিছু নোবেলজয়ী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীসহ ১৬০ জন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি খোলা চিঠি দেয়।

চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরায় দিলীপ কুমার

আগরওয়ালাকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গণভবনে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দলীয় নানা বিষয়সহ চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে এ সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসি মুখে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং চুয়াডাঙ্গাবাসীর উন্নয়নে করা সকল কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।

এরপর জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এদেশে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তারা যে ধর্মেরই হোক, কেউই সংখ্যালঘু নয়।এদেশে সব ধর্মের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। আর ধর্ম যার যার, উৎসব সবার-এই নীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বাস করে। তাই নিজেদের সংখ্যালঘু না ভাবতে সনাতন ধর্মের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সব ধর্মের উন্নয়নে সমানভাবে কাজ করছে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিন্দুরা মন্দিরে যাবে আর মুসলিমরা মসজিদে যাবে। সবার ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষাও এখান থেকে নিশ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, শ্রী কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল দুষ্টের দমন শিষ্টের লালনের জন্য। সেই শিক্ষা বাস্তবায়নের তাগিদ দেন সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব ধর্মের মর্মবাণী এক ও অভিন্ন। ভাষা হয়ত ভিন্ন হতে পারে। আমাদের দেশের কিছু মানুষ বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের বদনাম করে। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এবিষয়ে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সাথে যোগাযোগ করা হলে, তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গণভবনে গিয়েছিলাম। শুভেচ্ছা বিনিময় ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রীকে অনেক কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি যখন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও দলীয় নানা বিষয়সহ চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করছিলাম, তখন ওনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শোনেন। এছাড়া গত দশ বছর যাবত চুয়াডাঙ্গা জেলায় আমি যেসব উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি সেবিষয়েও কিছুটা বলার সুযোগ প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিয়েছিলেন। আমার সব কথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখেই আমাকে নানা নির্দেশনা দেন। এছাড়া জননেত্রী তখন আমাকে আগামী দিনের পথচলার সকল নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আরও বলেন আমি যেভাবে চুয়াডাঙ্গাবাসীর সঙ্গে আছি এবং তাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি সেই কাজ যেন অব্যাহত রাখি।

দিলীপ কুমার আরও বলেন, আমি জননেত্রীকে কথা দিয়েছি, আমরণ নৌকার পক্ষে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী রাখতে এবং দেশবাসীর উন্নয়নে কাজ করে যাব।

মাওয়া-ভাঙ্গায় প্রথম ট্রেনের হুইসেল: উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের মানুষ

প্রথম বারের মতো মাওয়া-ভাঙ্গায় বাজলো ট্রেনের প্রথম হুইসেল। ‘কু ঝিক ঝিক’ ট্রেনের শব্দে উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গে চলাচল করছে পরীক্ষামূলক ট্রেন। আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

মাওয়া-ভাঙ্গায় ট্রেন চলাচল দেখে আবেগ আপ্লুত পদ্মা নদীর দুই পাড়ের মানুষ। অনেকে আনন্দে কেঁদেছেন। কেউ আবার নিজের সন্তানকে দেখিয়েছেন ট্রেন চলাচল। এযেন স্বপ্নকে হাতের মুঠোও পাওয়া।

ভাঙ্গার তুজারপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান পরিমল চন্দ্র দাস বলেন, আমাদের অনেক দিনের আশা, এই এলাকার মানুষ ট্রেনে চড়ে ঢাকায় যাবেন। অল্প খরচে ও নিরাপদে ঢাকা পৌঁছে দিনের কাজ শেষ করে আবার এলাকায় ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে। এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভাঙ্গা বাজারের ব্যবসায়ী জাবেদ সরদার নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জীবনে যা দেখতে পারি নাই, সেটা দেখে গেলাম। এই দৃশ্য জীবনে ভুলবো না। আজকে আমাদের আনন্দের দিন। ভাঙ্গা কলেজ পাড় এলাকার বাসিন্দা নাঈম ভুইয়া বলেন, পরীক্ষামূলক ট্রেনে চড়ে ভিষণ আনন্দিত। বললেন, শেখ হাসিনা যা করে দিয়েছেন তা কোনদিন শোধ করার নয়। আল্লাহ তাকে আরও বহু বছর বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদের এলাকা বদলে গেছে।

ভাঙ্গার ঘারোয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সফি উদ্দীন মোল্লা বলেন, আমাদের একটা স্বপ্নের পদ্মা সেতু, সেই সেতুতে রেল সংযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি বলেন, এই রেল চালু হওয়ায় আমাদের এলাকার আমুল পরিবর্তন হবে। আমাদের এলাকার কৃষকরা লাভবান হবেন। তাদের উৎপাদিত সবজি সহজেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যাবে। নগরবাসী কম দামে টাটকা সবজি খেতে পারবেন।

ঘারোয়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. মনসুর মুন্সি বলেন, আজকে অনেক ভালো লাগছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যাবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তার কারণেই আজ এ অঞ্চলের মানুষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক সুবিধা পেয়েছেন। সড়ক সেতুর পর এখন ট্রেনও চালু হওয়ার পথে। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। প্রার্থনা করি আল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।

স্থানীয়রা বলেন, পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চালুর কারণে যে শুধু মানুষের যাতার্য়াতের সুবিধা হবে তা কিন্তু নয়। এর ফলে এই অঞ্চলের অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যাবে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পঞ্চিমাঞ্চলের কৃষক এতদিন উৎপাদিত পণ্য নিজের এলাকাতেই বিক্রি করতেন। এখন সেগুলো পৌছে যাবে দেশের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। এতে করে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ স্বাবলম্বি হবেন। এ কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তার কারণেই এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হতে

যাচ্ছে। পদ্মা সেতু চালুর পর মানুষের ভাগ্যের চাকা পাল্টে গেছে। এখন ট্রেন চলাচল শুরু হলে কম খরচে পণ্য পরিবহন করা যাবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ঢাকার কমলাপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া পরীক্ষামূলক ট্রেনটি দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ভাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছে যায়। এ যাত্রায় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটারের পদ্মা সেতু পাড়ি দিতে ট্রেনটির সময় লাগে মাত্র সাত মিনিট।

কমলাপুর ছাড়ার আগে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সাংবাদিকদের বলেন, পদ্মা সেতুতে রেল যুক্ত হওয়ায় শুধু দক্ষিণাঞ্চল নয়, সারা দেশের মানুষ এর সুফল পাবে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন বয়ে আনবে। আমরা যেভাবে রেলের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করছি, এর সুফল দেশের মানুষ পাবে।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণসহ পদ্মা সেতু রেল সংযোগের পুরো প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালে জুনের মধ্যে শেষ হবে। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এ কারণে আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পর পরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, পুরো প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে। ইতিমধ্যে মাওয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত অংশের কাজ শেষ হয়েছে।

প্রকল্প সূত্র জানা গেছে, পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-যশোর পর্যন্ত তিনটি অংশে রেলপথটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা-যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার মেইন লাইন, ঢাকা-গেন্ডারিয়া পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার ডাবল লাইন, লুপ, সাইডিং ও ওয়াই-কানেকশসসহ মোট ২১৫ দশমিক ২২ কিলোমিটার ব্রড গেজ রেললাইন নির্মাণ করা হচ্ছে।

গত বছর ২৬ জুন পদ্মা সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের প্রায় তিন মাস পর গত বছর ২০ আগস্ট পদ্মার মূল সেতুর জাজিরা প্রান্তে রেললাইন বসানোর কাজের উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী। মূল এবং দুপাশের ভায়াডাক্ট মিলিয়ে পদ্মা রেলসেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ৬৮ কিলোমিটার। রেলসেতুতে আটটি মুভমেন্ট জয়েন্ট রয়েছে। বিশেষ তাপমাত্রায় মুভমেন্ট জয়েন্টের ইস্পাতের স্লিপারগুলো চীন থেকে তৈরি করে আনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি ২০১৬ সালের ডিপিপি অনুমোদনের সময় ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৪ হাজার ৯৮৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। মেয়াদ ধরা হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু ২০১৯ সালের এপ্রিলে প্রকল্পের ব্যয় আরও ৪ হাজার ২৬৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা বৃদ্ধি করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩৯ হাজার ২৫৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা। এছাড়া ২০২৪ সালে জুনে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো প্রস্তাব অনুমোদন দেয় একনেক।
জিটুজি ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থায়নে করছে চায়না এক্সিম ব্যাংক। এর মধ্যে এক্সিম ব্যাংকের ঋণ সহায়তা হচ্ছে ২১ হাজার ৩৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। বাকি ১৮ হাজার ২২১ কোটি ৪৪ টাকা ব্যয় হবে সরকারি তহবিল থেকে। মূল প্রকল্পে ৩৪ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ছিলো ৯ হাজার ৯৫৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। প্রকল্পটিতে সরকারি অর্থায়ন ১৮ হাজার ২২১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া চীন সরকার জি-টু-জি পদ্ধতিতে ২১ হাজার ৩৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছে। যা আগে ছিল ২৪ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের এপ্রিলে চীনের সঙ্গে চূড়ান্ত ঋণচুক্তি হয়। এর দুই বছর আগে কমার্শিয়াল চুক্তি হয়েছিল। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ করছে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিআরইসি।
থাকছে ২০টি স্টেশন

পদ্মারেল সংযোগ প্রকল্পে কমলাপুর থেকে যশোর পর্যন্ত ২০টি স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৪টি স্টেশনই হবে নতুন। পুরোনো ছয়টি স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে। কেরানীগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের নিমতলায় নতুন দুটি স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও মাওয়া স্টেশন নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাওয়া স্টেশনের পরে পদ্মা সেতু পার হয়ে শরীয়তপুরের জাজিরায় নির্মিত হচ্ছে ‘পদ্মা স্টেশন’। পদ্মা স্টেশনের পরে শরীয়তপুরে ‘শিবচর স্টেশন’।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় উন্নত দেশের আদলে নির্মাণ করা হচ্ছে জংশন। ভাঙ্গা থেকে একটি লুপ লাইন ফরিদপুর সদর ও অন্য একটি লুপ লাইন নাগরকান্দা পর্যন্ত যাবে। প্রকল্পের আওতায় নাগরকান্দায় স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এরপরে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর ও মহেশপুরে নির্মিত হবে দু’টি রেলস্টেশন। এছাড়া নড়াইলের লোহাগড়া, নড়াইল সদরে একটি করে স্টেশন নির্মাণ করা হবে। যশোরের জামদিয়া ও পদ্মবিলে দুটি নতুন স্টেশন নির্মাণ করা হবে বলে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ছয়টি রেলস্টেশন ঢেলে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। এছাড়া গেন্ডারিয়া ও ফরিদপুরের ভাঙ্গা স্টেশন নান্দনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। সংস্কার করা হচ্ছে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি, যশোরের সিংগাই ও রূপদিয়া স্টেশন।

রিজার্ভের পরিমাণ সন্তোষজনক, চলবে সাড়ে চার মাসের বেশি

করোনাভাইরাস মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যে ধাক্কা দেশের রিজার্ভে লেগেছিল, সরকারের নানামুখী পদক্ষেপে তা অনেকটাই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতেই আমদানিকে নিরূৎসাহিত করা হয়েছিল, যার সুফলও মিলতে শুরু করেছে।

গত বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলো নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৯ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক ০৬ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, বর্তমানে যে রিজার্ভ আছে তাতে উদ্বেগের কিছু নেই। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষ সময়ে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে বৈদশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র তিন দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারের নানামুখি পদক্ষেপের কারণে এরইমধ্যে রিজার্ভের উন্নতি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রথমে কোভিড মহামারী এবং তার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্বের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে

টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেক দেশই পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। সে তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালোভাবেই সচল রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নানামুখি পদক্ষেপের কারণে দেশের কৃষি অর্থনীতিও অনেক ভালো অবস্থায় আছে। যদিও ডলার সংকট মোকাবেলায় সরকার আমদানি নির্ভরতা কমাতে জোর দিয়েছে। এতে পরিস্থিতি দারুণভাবে সামাল দেওয়া যাচ্ছে।

বৈদশিক মুদ্রার রিজার্ভ সম্পর্ক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক এসব তথ্য জানিয়ে বলেন, “রিজার্ভ কমছে বলে যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে সেটি সঠিক নয়। ২০০৬ সালের তুলনায় বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ সন্তোষজনক। এখন যে পরিমাণ রিজার্ভ আছে তাতে সাড়ে চার মাসের বেশি চলবে।”

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিভিন্ন পণ্য আমদানির জন্য ৪৩৭ কোটি ২৪ লাখ (৪.৩৭ বিলিয়ন) ডলারের ঋণপত্র বা এলসি খুলেছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। যদিও এই অঙ্ক গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩১ দশমিক ১৯ শতাংশ কম।

২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই মাসে ৬৩৫ কোটি ৪০ লাখ (৬.৩৫ বিলিয়ন) ডলারের এলসি খোলা হয়েছিল। অন্যদিকে এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ২০ দশমিক ১৪ শতাংশ। গত জুলাইয়ে ৭৪৯ কোটি ১৮ লাখ (৭.৪৯ বিলিয়ন) ডলারের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে ৫৯৮ কোটি ৩০ লাখ (৫.৯৮ বিলিয়ন) ডলারের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছিল।

যদিও ডলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির লাগাম টেনে ধরতে নানা পদক্ষেপ নেয়। এ কারণে গত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের শুরুতে এলসি খোলার পরিমাণ কিছুটা কমেছে। তবে এটা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের পুরো সময়ে (২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জুন) বিভিন্ন পণ্য আমদানির জন্য সবমিলিয়ে সাত হাজার ২১৯ কোটি ৮০ লাখ (৭২.২০ বিলিয়ন) ডলারের এলসি খুলেছিলেন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। যা ছিল আগের অর্থবছরের (২০২১-২২) চেয়ে প্রায় ২৬ শতাংশ কম।

গত ১২ জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কথামতো রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই দিন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘গ্রস’ হিসাবের পাশাপাশি বিপিএম৬ পদ্ধতি

অনুসরণ করেও রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন অর্থনীতিবিদরা।

ওই দিন (১২ জুলাই) ‘গ্রস’ রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৯ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার।

অবশ্য গত দেড় মাসে ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভ কমেছে ৬৫ কোটি ডলার। আর বিপিএম৬ পদ্ধতির হিসাবে কমেছে ৪১ কোটি ডলার।

আমদানি কমায় এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স ও রপ্তানি আয় বাড়ায় ২০২১ সালের আগস্টে এই রিজার্ভ বাড়তে বাড়তে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলারের গ্রস রিজার্ভ (তখন বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাব করা হত না) মাইলফলক অতিক্রম করেছিল।

এরপর আমদানি বাড়ায় এবং রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স কিছুটা কম যাওয়ায় হোঁচট খাওয়ায় রিজার্ভও কিছুটা কমতে থাকে। এ কারণে অর্থনীতিতে কিছুটা চাপ বাড়তে থাকে। এ কারণে গত বছরের এপ্রিল থেকে আমদানি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে আমদানি খরচ বেশ কমে এসেছে।

অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) জুলাই-আগস্ট মেয়াদের আমদানি বিল পরিশোধ করতে হবে। তখন রিজার্ভ আরেকটু কমে আসবে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের আমদানি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়, জুলাই মাসে খাদ্য (চাল ও গম) আমদানির এলসি কমেছে ২১ দশমিক শূন্য এক শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল মেশিনারি (মূলধনি যন্ত্রপাতি) আমদানির এলসি কমেছে সবচেয়ে ২২ দশমিক ১৭ শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ১ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

শিল্পের মধ্যবর্তী পণ্য (ইন্টারমেডিয়েট গুডস) আমদানির এলসি কমেছে ৩০ দশমিক ৬৫ শতাংশ; নিস্পত্তি কমেছে ১৭ শতাংশ। জ্বালানি তেলের এলসি কমেছে ৫০ দশমিক ১২ শতাংশ; নিষ্পত্তি বেড়েছে ৩৬ দশমিক ৩৬

শতাংশ।

শিল্পের কাঁচামাল আমদানির এলসি কমেছে ৩৬ দশমিক ১২ শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ২৪ দশমিক ৩১ শতাংশ।

এছাড়া নতুন অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে অন্যান্য পণ্য আমদানির এলসি কমেছে ১৮ দশমিক ৬২ শতাংশ; নিষ্পত্তি কমেছে ১১ দশমিক ২১ শতাংশ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য আমদানিতে মোট ৬৯ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে বাংলাদেশ। যা ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ কম।

দেড় বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও ডলারের সংকট দেখা দিয়েছে। গত বছরের মার্চে দেশে মার্কিন ডলারের যে সংকট শুরু হয়েছিল, তা এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠা যায়নি। তেমনি রিজার্ভ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে ডলার বিক্রিও বন্ধ হয়ে যায়নি। এটা নিয়মিত চলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় আমদানি অব্যাহত রাখতে দুই বছরের বেশি সময় ধরে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে চলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করা হয়েছে এক হাজার ১৪৭ মিলিয়ন। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করেছে ১৩ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন।

২০২১-২২ অর্থবছরে ৭ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছিল। আর চলতি অর্থবছরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত (প্রায় দুই মাস) বিক্রি করা হয়েছে দেড় বিলিয়ন ডলারের মত। তবে সব ব্যাংকের কাছে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে না বাংলাদেশ ব্যাংক। শুধু সরকারের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করা হচ্ছে।

বৈদশিক মুদ্রার রিজার্ভসহ সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, “ডলার কেনাবেচা হচ্ছে। তবে সবাই যে ডলার বিক্রি করবে তাতো নাও হতে পারে। কারণ অনেকের কাছে ডলার নাও থাকতে পারে। যার কাছে নেই সে কেনাবেচা করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। যাদের কাছে আছে তারাই বিক্রি করবেন।”

ক্যাপাসিটি চার্জ কী বোঝা, নাকি সক্ষমতার ভিত্তি?

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সংসদে বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেন। তাতে দেখা যায় বর্তমান সরকার তিন মেয়াদের ১৪ বছরে কুইক রেন্টালের ভাড়া এবং ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। এনিয়ে দেশের দুই গণমাধ্যমে যে ভাবে সংবাদ ছেপেছে তাতে মনে হচ্ছে সরকারী বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অলস বসে থেকে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় করেছে সরকার। তথ্যের খেলায় পাঠকদের বিশেষ দিকে ধাবিত করার অপচেষ্টা।

কিছু গণমাধ্যমে যেভাবে উপস্থাপন
মঙ্গলবার সংসদে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। সেই তথ্য দিয়ে বুধবার প্রথম আলো প্রধান খবর হিসেবে প্রকাশ করেছে। শিরোনাম দেওয়া হয়েছে- “বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভাড়া কারা কতো পেলো”। আর ডেইলি স্টারের শিরোনাম ”ক্যাপাসিটি চার্জের বোঝা, চিন্তার চেয়েও বেশি। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সংসদে উপস্থাপিত তথ্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেনো প্রাইভেট বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দিচ্ছে সরকার। কেন কুইক রেন্টালগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দিচ্ছে এই নিয়ে কোথাও কোন ব্যাখা বা তথ্য দেয়া হয়নি।

কুইক রেন্টাল কেন এলো
৩০ বছর আগেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি হিসাবে বিবেচনা করা হতো তেল আর গ্যাসকে। তার আগে হতো জলবিদ্যুৎ। ২০০০ সালের আগে পরে তেলের দাম কম থাকতে তেল নির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করতে শুরু করে বড় প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো। তখন ১/২ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ সমৃদ্ধ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিদ্যুৎকেন্দ্র করবার সক্ষমতা ছিল না। আর ২০০৯ সালে ৩২৬৮ মেগাওয়াট সক্ষমতা নিয়ে দেশে প্রয়োজন ছিল চটজলদি বিদ্যুৎ আর সঞ্চালন লাইন, সাবস্টেশন নির্মাণসহ ভবিষ্যতের বিদ্যুৎকেন্দ্র

নির্মাণের পরিকল্পনা। দিনে ১৫/১৬ ঘণ্টার লোডশেডিং ও বিদ্যুতের কারণে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস থেকে চটজলদি বিদ্যুৎ এর জন্য কুইক রেন্টালের কোন বিকল্প ছিল না সেই সময়ে।

ক্যাপাসিটি চার্জ কী
প্রাইভেট কুইক রেন্টাল থেকে সরকার নগদ টাকায় বিদ্যুৎ কিনে নেয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু প্রাইভেট এই ইনভেস্টরদের ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন এর কথাটা মাথায় রাখা আবশ্যক ছিল। কেউ ১/২ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করে একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাচ্ছে, এখন সরকারের যদি বিদ্যুতের অল্টারনেটিভ সোর্স তৈরি হয়ে যায় আর বিদ্যুৎ না কেনে ওই সকল কেন্দ্র থেকে তাহলে কি হবে? এতো ইনভেস্টমেন্ট তো মাঠে মারা যাবে। তখন আসে ক্যাপাসিটি চার্জ বিষয়টা।

মানে সরকার যদি বিদ্যুৎ নাও কেনে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মিনিমাম একটা এমাউন্ট ওই বিদ্যুৎ কোম্পানিকে দিতে হবে, যতদিন সেই প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত মূলধন, খরচ আর লাভ উঠে না আসে। কোন কোন বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর সময়টা ১৫ থেকে ২৫ বছরের একটা চুক্তি। আবার প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও যদি সরকারের বিদ্যুৎ প্রয়োজন থাকে তাহলে ৩/৪ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করতে পারবে।

আপনি হলে কী করতেন
একটা বিশেষ পণ্যের ব্যবসা শুরু করলেন যেটা শুধু সরকার কিনতে পারবে। সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য আপনি ৫০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে কারখানা বানালেন। এখন দুই বছর পরে হুট্ করে যদি সরকার বলে তারা আপনার কাছ থেকে আর পণ্য কিনবে না কারণ আরেকটা কারখানা থেকে তারা আও সহজেই পণ্য কিনতে পারছে, তখন আপনি কি করবেন? আপনি অবশ্যই আপনার লাভসহ বিনিয়োগ উঠে আসার নিশ্চয়তা চাইবেন, এই নিশ্চয়তা থেকেই এসেছে ক্যাপাসিটি চার্জ বিষয়টা। অর্থাৎ চুক্তির নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যদি সেই সকল কুইক রেন্টাল থেকে বিদ্যুৎ না কেনে, তাহলে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট একটা চার্জ দিতে হবে কুইক রেন্টালগুলোকে, যেটা “ক্যাপাসিটি চার্জ” হিসাবে পরিচিত।

ক্যাপাসিটি চার্জ কেন নিরাপদ সিদ্ধান্ত
২০১৪/১৫ থেকে সম্ভবত সরকার কয়লা বিদ্যুতের দিকে গেছে, যেখানে সরকার নিজেই বিনিয়োগ করে বা সহজ শর্তে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে, বা যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাচ্ছে। এখন এই সকল

কয়লা আর এলএনজি নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কিনলে বেশি দাম দিয়ে তেল নির্ভর প্রাইভেট প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কেনার প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেল ভিত্তিক ভাড়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনাটা অনেক দাম পরে যাচ্ছে, কারণ ২০০০ সালে যেই তেলের দাম ছিল ১২ টাকা লিটার, বর্তমানে সেই তেলের দাম ১০৯ টাকা লিটার। তাই বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনলে সরকারের যা খরচ হবে, তারচেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে দিলে খরচ কম হবে, এই চিন্তা থেকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে দেয়াটাই নিরাপদ সিন্ধান্ত।

বর্তমানে ১০২ টি বেসরকারি বিদ্যুতকেন্দ্রের মধ্যে ৮টি কুইক রেন্টালের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সরকার চুক্তি নবায়ন করেনি। কারণ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ও নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে, সরকারের আর প্রয়োজন নেই সেই সকল কুইক রেন্টাল থেকে বিদ্যুৎ কেনার। কিছু কুইক রেন্টাল থেকে চুক্তির বাধ্যবাধকাতার কারণে বিদ্যুৎ এখনও কিনতে হচ্ছে সরকারকে, বা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে। কারণ বর্তমানে মোট প্রয়োজনের মাত্র ৪৪ শতাংশ সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন করতে পারছে। এখনও ৪৩ শতাংশ বিদ্যুতের জন্য বেসরকারি রেন্টালের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে সরকারকে।

এখন ২০২৩ এ বসে সেই চুক্তি আর ক্যাপাসিটি চার্জকে অনর্থক মনে হতেই পারে। কিন্তু ৯৬/৯৭/৯৮ সালে ওই প্রাইভেট কোম্পানির শর্তে রাজি না হলে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদনই সম্ভব হতো না তখন। শিল্পের উৎপাদন আর লোডশেডিং থেকে নিস্তারের জন্য বসে থাকতে হতো আরও ৭/৮ বছর।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গত ১৪ বছরে সরকারি বিনিয়োগে বিদ্যুতের বড় বড় প্রকল্পের সাথে সাথে সরকার বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন বাড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বেড়েছে আধুনিক টেকনোলজি সম্পন্ন সাবস্টেশনের সংখ্যা। বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ।